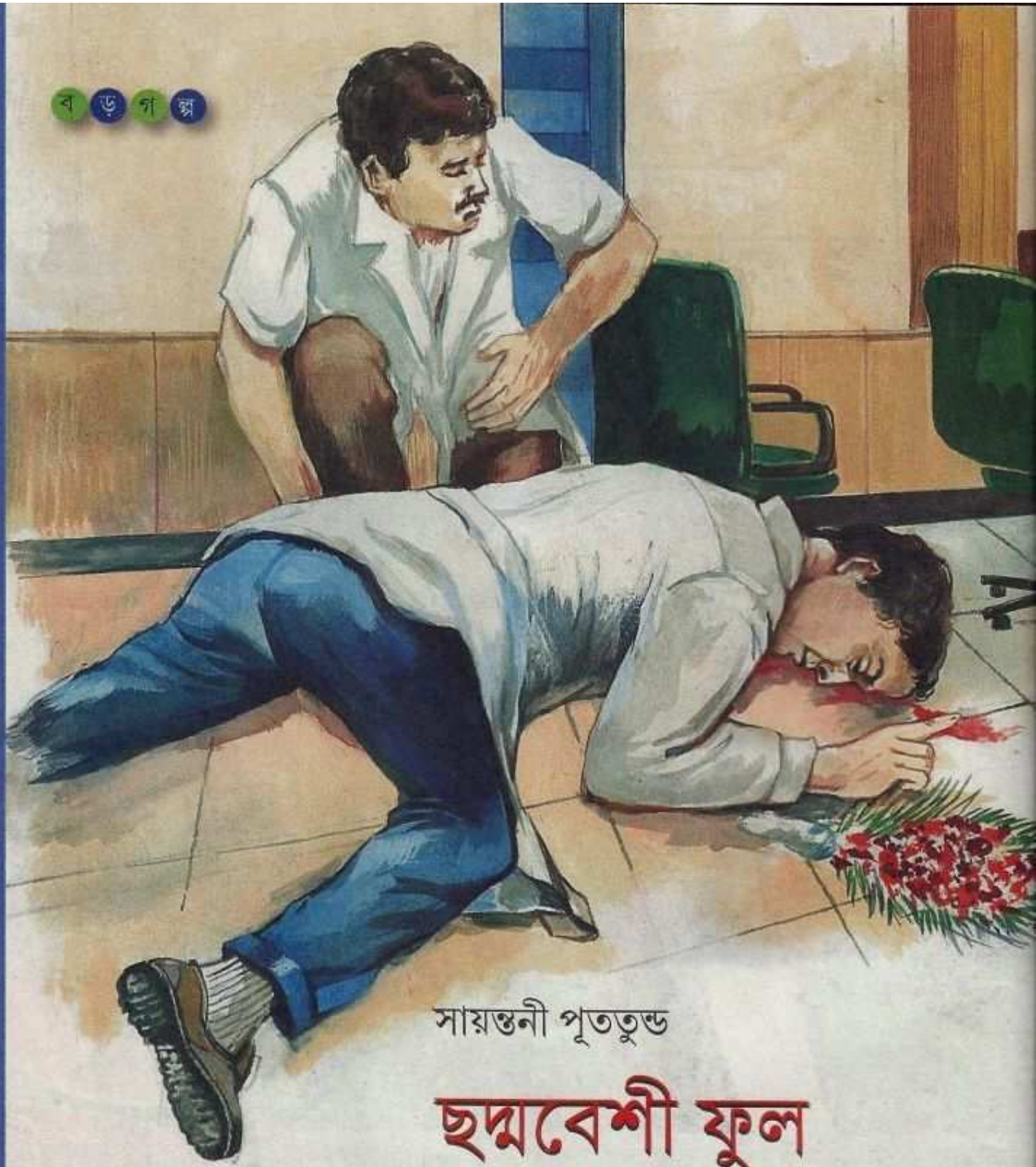

সায়ন্তনী পূততুন্ড

ছদ্মবেশী ফুল

হঠাৎ প্রচণ্ড জোরে ল্যাবের অ্যালার্ম বেজে উঠল। এতক্ষণ ল্যাবরেটরির ভিতরে কোনও আওয়াজ ছিল না। অন্য দিনও বিশেষ থাকে না। শুধু মাঝে-মধ্যে টেস্টটিউবের টুংটাং আর বিকারে জল গরম করার খলবল শব্দ অস্ফুট ভাবে শোনা যায়। ভিতরের মানুষগুলো ক্বচিৎ কথা বলে। তাদের কথা বলার সময় কোথায়? সকলেই সাদা অ্যাপ্রন পরে কাজ করতেই ব্যস্ত।

আজ সকালেও এমন শান্ত পরিবেশ ছিল। ল্যাবের মুখ্য বিজ্ঞানী ডঃ হিঙ্গোরানি একটি গোপন আবিষ্কার নিয়ে ব্যস্ত

আছেন। এই ঘরে সকলের প্রবেশ নিষিদ্ধ। একমাত্র ডঃ হিঙ্গোরানিই প্রাইভেট পাসওয়ার্ড দিয়ে ওই ঘর খুলতে পারেন। ব্যাপারটার সঙ্গে ডিফেন্স মিনিস্ট্রি ওতপ্রোতভাবে জড়িত বলেই এত কড়াকড়ি, এত গোপনীয়তা। নতুন আবিষ্কার নিয়ে একাই দিনরাত কাজ করে যাচ্ছেন। এমনকী, আমাকেও সাহায্য করতে দেননি।

আজও প্রায় সকাল আটটায় এসে সোজা ঢুকে গিয়েছেন নিজের ল্যাবে। আর তাঁর প্রধান অ্যাসিস্ট্যান্ট ডঃ অনুপম সেন, মানে আমি, আমার নিজস্ব কেবিনে বসে কয়েকটা প্রয়োজনীয় রিপোর্ট তৈরি করছি।

এমন সময় অ্যালার্মের পরিত্রাহি চিৎকার। ক্যাঁওক্যাঁও করে সমস্ত ল্যাবরেটরিকে সচকিত করে তারস্বরে বেজে উঠল।

উপস্থিত সকলে চমকে ওঠে। অ্যালার্ম বাজছে কেন? আওয়াজটা সবচেয়ে বেশি জোরে আসছে ডঃ হিঙ্গোরানির ল্যাব থেকে।

বুকের ভিতরটা প্রায় লাফিয়ে উঠল। কী হল? ডঃ হিঙ্গোরানির কিছু হল না তো। নতুন আবিষ্কারটা ঠিক আছে?

তখন কিছু বলার বা ভাবার মতো অবস্থা ছিল না। সকলে উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়েছে ডঃ হিঙ্গোরানির প্রাইভেট ল্যাবের দিকে। আমার সহযোগী গৌতম উলটো দিক থেকে পড়িমরি করে ছুটে এল। বেচারা অ্যালার্মের শব্দে ঘাবড়ে গিয়েছে। হাঁপাতে-হাঁপাতে এসে কোনওমতে বলল, "স্যার, কী হল? অ্যালার্ম বাজছে!"

কোনওমতে উত্তর দিই, "জানি না।"

"ডঃ হিঙ্গোরানি,", সে ভয়ার্ত ভাবে বলে, "ওঁর ঘরেই তো অ্যালার্ম বাজছে মনে হয়।"

প্রায় দৌড়তে-দৌড়তে জবাব দিলাম, "হ্যাঁ, চল শিগগিরি, দেখি কী হল।"

অন্য দিন ডক্টরের প্রাইভেট ল্যাবের লোহার দরজা পাসওয়ার্ড সিস্টেমে বন্ধ থাকে। আজও তেমনই থাকার কথা। কিন্তু দরজায় হাত রেখেই এক নতুন ট্রেনি গবেষকের ভুরু কুঁচকে গেল।

"ডঃ সেন," সে একটু ভয় পেয়ে পিছিয়ে এসেছে। তার কণ্ঠস্বরে বিস্ময়, "দরজাটা খোলা!"

দরজা খোলা! ভাবাই যায় না। এই দরজা দিনে দু' বারেই খোলে। যখন ডঃ হিঙ্গোরানি ল্যাবে ঢোকেন তখন একবার, আর যখন বেরিয়ে যান স্রেফ তখন। এর মধ্যে ল্যাবের দরজা কোনওমতেই খোলা সম্ভব নয়। এ দরজা শুধু পাসওয়ার্ডে খোলে। আর পাসওয়ার্ড ডক্টর নিজে ছাড়া কেউ জানে না। কিন্তু সেই মুহূর্তে একটা ভীষণ অমঙ্গলের ছায়া সকলের মুখেই ছাপ ফেলে সরে-সরে যাচ্ছিল।

"ডঃ সেন! স্যার, আপনি দেখুন," গৌতম ফিসফিস করে বলে, "আমি সাহস পাচ্ছি না।"

সাহস তো আমিও পাচ্ছিলাম না। দরজাটা খোলা দেখেই ভয়ে ঘামছি। ভিতরে রয়েছেন ডক্টর আর তাঁর গোপনীয় এবং অমূল্য আবিষ্কার। ঘরে ঢুকে কী দেখব সেই আশঙ্কায় কাঁটা হয়েছিলাম। তবু কাউকে তো এগোতেই হবে।

ভিতরে তখনও পুরোদমে এসি চলছে। ঠান্ডার স্পর্শে শরীর ছ্যাঁত করে উঠল। চতুর্দিকে সার-সার সাজানো কেমিক্যালের শিশি। কাচের বাক্সে রাখা স্পেসিমেন। কোনওটা আবার এমনিই রাখা।

"ডঃ হিঙ্গোরানি, ড-ক্ট-র।"

কোনও সাড়া নেই। ল্যাবের ভিতরের টিউবটা শুধু দপদপ করে জ্বলার চেষ্টা করছে। কিন্তু পুরোপুরি জ্বলছে না। থেকে-থেকে জ্বলছে আর নিভছে।

আমরা গুটিগুটি পায়ে এগিয়ে গেলাম ভিতরের দিকে। ডান দিকে বইয়ের সেল্‌ফ। বইগুলো এলোমেলোভাবে পড়ে আছে, যেন ওগুলোর উপর দিয়ে ঝড় বয়ে গিয়েছে।

অথচ এমন হওয়ার কথাই নয়। ডক্টর ভীষণ গোছানো প্রকৃতির। বিশেষ করে বইয়ের যত্ন নেওয়ার ব্যাপারে তিনি ভীষণ খুঁতখুঁতে। তাঁর ব্যক্তিগত লাইব্রেরির একটু অযত্ন হলেই আমায় পাঁচ কথা শুনিয়ে ছাড়েন। কোনও বইয়ের পাতা সামান্য ছেঁড়া দেখলেই সারা অফিস মাথায় তোলেন।

সেই লোকের ঘরে বইয়ের এই অবস্থা!

"ডক্টর, ডক্টর হিঙ্গোরানি, স্যার।"

"অ-নু-প-ম।"

এবার উত্তর এল। কিন্তু একদম অস্বাভাবিক উত্তর। ডক্টরের কণ্ঠস্বর শুনেই বুঝেছিলাম কিছু একটা হয়েছে। আরও একটু এগিয়ে যেতেই যা চোখে পড়ল, তা দেখে আঁতকে উঠি।

ডক্টর প্রায় বেহুঁশের মতো পড়ে আছেন মাটিতে। মাথা ফেটে গলগল করে রক্ত পড়ছে।

"স্যার, স্যার," ব্যাকুল হয়ে তাঁকে কোনওমতে তোলার চেষ্টা করি। ডক্টর নির্জীবের মতো এলিয়ে পড়লেন। প্রায় সর্বহারার মতো আঙুল তুলে সামনের কাচের বাক্সটা নির্দেশ করলেন, "এই দ্যাখো।"

কী সর্বনাশ! বাক্সটা ফাঁকা। সেখানে ক্যামুফ্লেজিয়া নেই।

॥ ২ ॥

"ক্যামুফ্লেজিয়া মিসিং? হাউ ক্যান ইট বি পসিবল?"

মন্ত্রীর ভুরু দু'টো ঠিক শুঁয়োপোকার মতো দেখাচ্ছিল। মুখে চিন্তার ছাপ প্রকট।

"আমি জানি না," ক্লান্ত স্বরে বলছিলেন ডঃ হিঙ্গোরানি। মাথায় তিনটে স্টিচ নিয়ে তাঁকে আরও ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। ব্যান্ডেজ করা কপালে হাত রেখে চুপ করে বসে ছিলেন।

"কীভাবে এরকম হয়? এরকম গুরুত্বপূর্ণ একটা আবিষ্কার!" রেগে গিয়ে বললেন মন্ত্রী, "আপনাদের সুরক্ষাপ্রণালীই কাঁচা। এবার আমি উপরমহলকে কী জবাব দেব?"

অনেক যুক্তি দিয়েও কিছুতেই তাঁকে বোঝানো গেল না, ক্যামুফ্লেজিয়াকে যথেষ্ট কড়া নজরেই রাখা হয়েছিল। ডঃ হিঙ্গোরানির সুরক্ষা ব্যবস্থা প্রায় নিশ্ছিদ্রই বলা যায়। তা সত্ত্বেও দুষ্কৃতি কোথা দিয়ে ঢুকল, তা বুঝতে পারছে না কেউই।

"এরকম একটা গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার," তিনি আরও চটে গিয়ে বললেন, "ডিফেন্স মিনিস্ট্রি কয়েক কোটি টাকা ঢেলেছে এটার পিছনে। ডঃ হিঙ্গোরানি, আপনার কাছ থেকে এটা আশা করিনি।"

"হ্যাং ইয়োর কয়েক কোটি টাকা," এবার ডক্টরের ধৈর্যও জবাব দিয়েছে, "আপনি কয়েক কোটি টাকা দেখছেন? কয়েক কোটি মানুষের কথা ভাবছেন না? ওটা কোনও সাধারণ জিনিস নয়। দ্যাট ইজ আ মার্ডার ওয়েপন। আ ভেরি ডেঞ্জারাস মার্ডার ওয়েপন! এত কোটির দেশে সেটা একবার বেরিয়ে পড়লে কেউ বাঁচবে না। নট আ সিঙ্গল ওয়ান, বুঝেছেন?"

মন্ত্রী কটমট করে ডক্টরের দিকে তাকাচ্ছেন, "জানি, তাই তদন্ত দরকার। এভাবে ওটাকে বাইরে ছেড়ে দিতে পারি না আমরা। এই চোর জানে যে, জিনিসটা কোথায় রাখা ছিল। আপনার পাসওয়ার্ড ভেঙে সে ঘরে ঢুকেছে, অথচ এখানকার সিকিউরিটির কোনও স্টাফ কোনও অপরিচিত লোককে ঢুকতে বা বেরোতে দেখেননি।"

সকলে একসঙ্গে মাথা নাড়ল।

"তা হলে সে কোনও বাইরের কেউ নয়। ঘরেরই লোক।

এই ল্যাবের কোনও কর্মী।" মন্ত্রীমশাই আমাদের সকলের দিকে রক্তচক্ষু করে তাকালেন, "আপনারাই কোনও লোক।"

একেই অমন মারাত্মক জিনিসটা চুরি যাওয়ার আতঙ্ক তো ছিলই, তার উপর আবার নতুন আপদ জুটল। সন্দেহ!

ক্যামুফ্লেজিয়া জিনিসটা বার দু'য়েক দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার। একটা সামান্য ঘাসফুলের মতো দেখতে জিনিসটা। কেউ দেখলে ভাববেই না যে, জিনিসটা অমন মারাত্মক।

ঘাসফুলের একটি প্রজাতির জেনেটিক কোড ব্রেক করে বিশেষ ভাবে ডিএনএ তৈরি করার পর ক্যামুফ্লেজিয়া জন্মেছে। মূল ফর্মুলাটা গুপ্ত। ডঃ বিবেক টৌডি, ডঃ হিঙ্গোরানি এবং ডঃ সুকুমার বসু ছাড়া আর কেউ জানেন না। জিনিসটা তৈরি হওয়ার পর একঝলক দেখেছিলাম। সাদা ধবধবে ছোট্ট একটা ফুল। ঘাসফুলই বলা যায়। কিন্তু তিন বিজ্ঞানী বলেছিলেন যে, "যতই নিরীহ হোক না কেন, এ ফুল মারাত্মক। এ ফুলের গন্ধ এতটাই বিষাক্ত যে, একটা ফুলই দশটা মানুষ মারার পক্ষে যথেষ্ট। অ্যাকোনিটামের বিষাক্ত ডিএনএ-র সঙ্গে মিলিয়ে যেহেতু তৈরি, তাই এর গন্ধে অ্যাকোনাইটের মতো মারাত্মক বিষ আছে। একবার নাকে গেলে রক্ষা নেই। কোমা অবধারিত এবং পরে মৃত্যু।"

ক্যামুফ্লেজিয়ার সবচেয়ে মারাত্মক বৈশিষ্ট্য যে, এটি রং পালটাতে পারে। এটা কী করে তিন বিজ্ঞানী করলেন, তা জানা যায়নি। কিন্তু ক্যামুফ্লেজিয়ার ডেমনস্ট্রেশনের সময়ই দেখেছি যে, এই ফুলটা অদ্ভুত ভাবে রং পালটায়।

প্রথমবার যখন দেখি, তখনই প্রায় চক্ষু চড়কগাছ হয়ে গিয়েছিল। ভাবতেই পারিনি যে, এমনও হতে পারে। ডেমনস্ট্রেশনের আগেই কনফারেন্স হলে উপস্থিত ছ'জন দর্শককে গ্যাস মাস্ক পরিয়ে দেওয়া হয়েছিল, যাতে নাকে গন্ধ না যায়। সেই ছ'জনের মধ্যে আমিও ছিলাম। বাকি পাঁচজন ডিফেন্স মিনিস্ট্রির হোমরাচোমরা।

দর্শকাসনে বসেই বিস্ফারিত চোখে দেখলাম, ডঃ হিঙ্গোরানি একটা গিনিপিগের বাক্সে ক্যামুফ্লেজিয়া রেখে দিলেন। এক মিনিটও লাগল না। গিনিপিগগুলো পটাপট মরে গেল।

শুধু এইটুকুই নয়, ডক্টর ফুলটা হাতে তুলে নিয়ে পিছনে একের পর-এক রঙের জিনিস রাখতে লাগলেন। কখনও ব্যাকগ্রাউন্ডে কালো, কখনও নীল, কখনও লাল।

আমরা বোকার মতো হাঁ করে দেখলাম ব্যাকগ্রাউন্ডের সঙ্গে মিলিয়ে-মিলিয়ে রং পালটাচ্ছে ক্যামুফ্লেজিয়া। একদম মিশে যাচ্ছে পিছনের জিনিসটার সঙ্গে।

এ এক অদ্ভুত অস্ত্র। একরাশ যে-কোনও ফুল, গাছ বা অন্য কিছুর মধ্যে একটা রেখে দিলে সেটাকে কেউ আলাদা করে চিনতে পারবে না। রং পালটে সে মিশে যাবে পিছনের বস্তুটির সঙ্গে এবং সেখান থেকেই বিষমাখা সুগন্ধ দিয়ে যাবে এই অদৃশ্য ফুল। তার সামনে বসে থাকা হতভাগা জীবটি বুঝতেও পারবে না যে, কখন তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে ছদ্মবেশী শমন। বোঝার আগেই শেষ।

ডিফেন্স মিনিস্ট্রির লোকরা উঠে দাঁড়িয়ে অভিনন্দন জানিয়েছিল ডক্টরকে। কিন্তু আমি ভয় পেয়েছিলাম। ভেবেছিলাম এই রকম ভয়ংকর অথচ নিরীহ চেহারার মারণাস্ত্র তৈরি করে কী সর্বনাশই না করলেন ডক্টর। কত নিরীহ মানুষের প্রাণ নেবে এই সাধারণ চেহারার ছদ্মবেশী ফুল, ক্যামুফ্লেজে সিদ্ধহস্ত ক্যামুফ্লেজিয়া।

কিন্তু ডিফেন্স মিনিস্ট্রির কাছে হস্তান্তরিত হওয়ার আগেই লোপাট হয়ে গেল ক্যামুফ্লেজিয়া। সঙ্গে-সঙ্গেই গোপনে চলল কড়া তদন্ত। আমাদের সকলের বাড়ি তোলপাড় করে সার্চ করা হল। কিন্তু কারও বিরুদ্ধেই কিছু পাওয়া গেল না।

তখন অন্য রাস্তা ধরল প্রতিরক্ষা মন্ত্রক। প্রতিটা দূতাবাসে খোঁজ রাখল। সন্দিগ্ধ লোকদের ফলো করল। সেখানেও কিছুই পাওয়া গেল না। শুধু একটা ব্যাপারে আশ্বস্ত হল তারা। ক্যামুফ্লেজিয়া যে চুরি করেছে, সে সেটা অন্য কোনও দেশকে বিক্রি করার জন্য চুরি করেনি। হয়তো তার অন্য কোনও উদ্দেশ্য আছে।

কিন্তু কী?

॥ ৩ ॥

উদ্দেশ্যটা বুঝতে অবশ্য এক সপ্তাহ সময় লাগল না।

প্রথমেই মারাত্মক কার্ডিয়াক অ্যাটাকে মারা গেলেন ডঃ বিবেক টৌডি।

তখনও ব্যাপারটাকে অস্বাভাবিক কিছু মনে হয়নি। হৃদযন্ত্রের সমস্যায় ভুগছিলেন তিনি। বয়সও হয়েছিল। তার উপর ডাক্তারদের বারবার বারণ করা সত্ত্বেও পানীয়র নেশাকে অতিক্রম করতে পারছিলেন না। তাই তাঁর মৃত্যুটা খুব আশ্চর্যজনক কিছু নয়। দুঃসংবাদটা শুনে আঘাত পেয়েছিলাম ঠিকই, কিন্তু অবাক হইনি।

কিন্তু ডঃ সুকুমার বসুও যখন হঠাৎ একদিন তাঁর বাড়িতেই পড়ে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে গেলেন, তখন ব্যাপারটা চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়াল। ডঃ বসুকে নার্সিংহোমে ভর্তি করা হলে ডাক্তাররা বললেন যে, তিনি কোমায় আছেন। সাইনাস ট্যাকিকার্ডিয়া এবং সঙ্গে ভয়ানক ভেন্ট্রিকুলার অ্যারিদমিয়াস। এই সব লক্ষণ শুনেই বুকের ভিতরটা কেমন-কেমন করতে লাগল, এ ঠিক সমাপতন নয়। এর পিছনে গুরুতর কোনও চক্রান্ত আছে।

ক্যামুফ্লেজিয়ায় অ্যাকোনিটামের পার্সেন্টেজ যথেষ্ট।

প্রথম মৃত্যুটাকেও তখন আর স্বাভাবিক বললে মনে হল না আমাদের। ডঃ বিবেক টোডি ও ডঃ বসু, দু' জনেই এমন মারাত্মক ভাবে হৃদযন্ত্রের অসুখে আক্রান্ত হলেন। তাও মাত্র তিনদিনের ব্যবধানে। কী করে হতে পারে? এ কি নিতান্তই কাকতালীয় না অন্য কিছু? দু'জনেই ক্যামুফ্লেজিয়ার আবিষ্কারে যুক্ত ছিলেন। এই দু' জন আর ডঃ হিঙ্গোরানি, এই তিনজনই তার জন্মদাতা। মূল ফরমুলাটা এরাই জানেন। তারপর আর কেউ যদি সামান্য কিছুও জেনে থাকে, সে আমি। প্রথম তিনজনকে সরিয়ে দিতে পারলে এই মারাত্মক অস্ত্রটি দ্বিতীয়বার আর আবিষ্কৃত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। সেক্ষেত্রে যে চুরি করেছে, তার কাছে ছাড়া আর কোথাও পাওয়া যাবে না ক্যামুফ্লেজিয়ার নমুনা। সমস্ত বৈদেশিক শক্তি, এর সঙ্গে ভারতও টাকার থলে নিয়ে তার পিছনে অসহায়ের মতো ছুটবে।

বেশ বুঝতে পারছি যে, এ আমাদের মধ্যেই কারও কীর্তি। কিন্তু কে? কে হতে পারে? এখানে প্রথম তিনজনের পরই আমার স্থান। আমি নই। তবে? গৌতম? কয়েকদিন গৌতমকে খুব চোখে-চোখে রাখলাম। কিন্তু তেমন কিছুই চোখে পড়ল না। সে স্বাভাবিক ভাবেই কাজ করছে। এবং যতদূর জানি এত বড় দুঃসাহসিক কাজ করার সাধ্যও তার নেই। সত্যি বলতে, এ অফিসের কারও আদৌ আছে কি না সন্দেহ।

তবু কেন জানি না, কাউকে বিশ্বাস করতে পারছি না। যাকেই দেখছি, মনে হচ্ছে, এই সে নয় তো?

থাকতে না পেরে একদিন ডঃ হিঙ্গোরানিকে কথাটা বলেই ফেললাম। মনে হচ্ছিল স্যারকে সতর্ক করাটা সত্যিই দরকার।

ডঃ হিঙ্গোরানির টেবিলের উপর একটা ফুলের বোকে রাখা ছিল। সম্ভবত গোলাপ ফুলের। তিনি আমায় একটা গ্যাস মাস্ক এগিয়ে দিয়ে বলেন, "পরে নাও অনুপম, গোলাপের গন্ধে তোমার আবার মারাত্মক অ্যালার্জি হয়। এই মুহূর্তে তুমিই আমার ডান হাত। তুমি অসুস্থ হয়ে পড়লে মুশকিল।"

গোলাপের গন্ধে সত্যিই আমার ভীষণ অ্যালার্জি। তাই বিনা বাক্য ব্যয়ে গ্যাস মাস্ক পরে নিই।

"হ্যাঁ, বলো কী বলছিলে?"

নিজের থিয়োরি ও সন্দেহের কথা স্পষ্ট করেই বললাম। শুনতে-শুনতে ভুরু কুঁচকে গেল তাঁর। কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থেকে বললেন, "তোমার সন্দেহ সঠিক কি না জানি না। ডঃ বসু এখনও কোমায়। কিন্তু দু' জনের ক্ষেত্রেই অ্যাসফিক্সিয়া বা অক্সিজেন ডেফিশিয়েন্সির লক্ষণ দেখা গিয়েছে। তোমার কথা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।"

"সেক্ষেত্রে স্যার আপনার সাবধান হওয়া উচিত।"

তিনি সরু দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকান, "শুধু আমারই নয়, তোমারও সাবধানে থাকা উচিত অনুপম।"

"আমি!" অবাক হয়ে বলি, "কিন্তু আমি তো খুব অল্পই জানি এ সম্বন্ধে।"

"সে তো তুমি আর আমি জানি।" ডক্টর শান্ত ভাবেই বললেন, "কিন্তু যার মাথায় একাই এই আবিষ্কারের পেটেন্ট নেওয়ার দুর্বুদ্ধি ঘুরছে, সে তো জানে না। তুমি আমার মেন অ্যাসিস্ট্যান্ট, ডান হাত যাকে বলে। আমার পরে তোমারই তো সব জানার কথা। পুরোটা না জানলেও অল্পবিস্তর তো জানোই। তোমায় ছেড়ে দেওয়ার ঝুঁকি কি সে নেবে?"

এ কথাটা আগে মাথায় আসেনি। ডঃ হিঙ্গোরানি বলার পর মেরুদণ্ড বেয়ে যেন একটা শীতল স্রোত বয়ে গেল। সত্যিই তো।

"এসব নিয়ে মাথা ঘামিও না অনুপম," তিনি সহজভাবেই বললেন, "এটা স্রেফ একটা কোইনসিডেন্স, আই হোপ।"

'আই হোপ' কথাটার মধ্যে তেমন জোর পাওয়া গেল না।

উনি যত সহজে ব্যাপারটা উড়িয়ে দিলেন, আমি কিন্তু অত সহজে পারলাম না।

ওঁর বলা শেষ কথাগুলো বারবার মনে পড়ে যাচ্ছিল। সত্যিই তো, আমাকেও কী ছাড়বে এই অজানা আততায়ী? ডঃ টোডি, ডঃ বসু এবং ডঃ হিঙ্গোরানির পর তো আমিই একমাত্র মানুষ, যে ক্যামুফ্লেজিয়া সম্পর্কে সামান্য হলেও খবর রাখি। অন্তত ক্যামুফ্লেজিয়াটা আমি স্বচক্ষে দেখেছি। দেখেছি, সেটা কীভাবে কাজ করে। তার সঙ্গে এও জানি যে, জিনিসটার এফেক্ট মানবশরীরে কী হয়, সিম্পটমগুলো ও মিক্সড ভেনামের নামটাও জানি।

গাড়িতে যেতে-যেতে বারবার কথাগুলো মাথার মধ্যে ঘুরছিল। বাড়িতে পৌঁছেও দুশ্চিন্তাটা মাথা থেকে গেল না।

আমার বাড়িটা বেশ বাংলোবাড়ির মতো করে সাজিয়েছি। ছোট্ট সুন্দর লাল টালি বসানো দোতলা বাড়ি। লাল টালিগুলো আমারই পছন্দ করে কেনা। সামনে ছোট্ট একটা বাগান। মালির যত্নে বেশ ঝকঝকে চকচকে হয়ে উঠেছে। বোগেনভিলিয়ার ঝাড়ে, নানা বিদেশি ফুল, লতায় মিশে রঙিন হয়ে উঠেছে। ভেলভেটের মতো ঘাসের সবুজ রঙে পান্নার ঔজ্জ্বল্য। দু' দিকে দু'টো ঝাউগাছ মালির যত্নে একদম নিঁখুত আকারে রাজার মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে।

রোজ বাড়িতে ঢোকার সময় এই বাগানটার দিকে তাকালেই মন ভাল হয়ে যায় আমার। কিন্তু আজ ভয় হল।

কে বলতে পারে, এই বাগানেই কেউ একটা ক্যামুফ্লেজিয়া রেখে যায়নি। ডক্টর হিঙ্গোরানির কাছে এও শুনেছি যে, এই স্পিশিজটা খুব তাড়াতাড়ি বংশবৃদ্ধি করে। মাত্র এক সপ্তাহের

মধ্যেই সে প্রায় একটা গোটা ব্যাটেলিয়ন তৈরি করে ফেলতে পারে। অসম্ভব শক্তিধর এই আবিষ্কার।

কোনওদিন এত খুঁটিয়ে বাগানটাকে দেখিনি। আজ খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখতে শুরু করলাম। নাগকেশরের ঝাড় রীতিমতো ফুলেফেঁপে উঠেছে। পাশে স্পাইনি অ্যাকান্থাস আর ফায়ারস্পাইক ফুটে রয়েছে। ইচ্ছে ছিল, অ্যান্থেনিয়ামও রাখব গ্লাসহাউস করে। কিন্তু ফুলগুলো বাঁচেনি।

আমার গোলাপের গন্ধে অ্যালার্জি। তাই গোলাপের কোনও প্রজাতিকেও রাখিনি। এ ছাড়া আরও বিভিন্ন ফুলে, গোলাপি, হলুদে, লালে জমকালো হয়ে উঠেছে আমার বাগান।

আজ ফুলের সৌন্দর্য দেখার মানসিকতা ছিল না। আমার সন্ধানী চোখ আঁতিপাতি করে খুঁজছিল রঙিন ফুলের মধ্যে একটা ছোট্ট বিশেষ ফুলকে। রঙের বিষয়ে সঠিক ভাবে বলা মুশকিল। হয়তো সে পুরোপুরি বেগুনি হয়ে মিশে গিয়েছে ডেজার্ট পিটুনিয়ার ভিড়ে। অথবা গোলাপি হয়ে আইসপ্ল্যান্টের মধ্যে চুপ করে লুকিয়ে বসে আছে। কিচ্ছু বলা যায় না, কিচ্ছু বলা যায় না। ক্যামুফ্লেজিয়ার পক্ষে সবই সম্ভব।

প্রায় গোরুখোঁজা খুঁজতে-খুঁজতেই হঠাৎ চোখে পড়ল ঘাসের ফাঁকে ছোট-ছোট সাদা ফুল।

ঘাসফুল? না।

টের পেলাম, হঠাৎ করেই বুকের ভিতরটা কেমন শুকিয়ে যাচ্ছে। এত ঘাসফুল কবে আমার বাগানে ফুটল? আগেই ফুটেছিল? না এখন? আজকেই?

"প্রতাপ... প্র-তা-প।"

নিজের কণ্ঠস্বরকেই আর তখন চিনতে পারছি না। গলা দিয়ে প্রায় আওয়াজ বেরোচ্ছিল না। তাই চেঁচিয়ে ডাকতে গিয়ে নিজের কানেই নিজের গলা ভীষণ কর্কশ শোনাল।

আমার তারস্বরে চিৎকার শুনে প্রতাপ প্রায় দৌড়তে-দৌড়তে আসে। আমায় এইভাবে চেঁচাতে ও আগে কখনও দেখেনি। রীতিমতো ঘাবড়ে গিয়েই সে ছুটে এসেছে।

"স্যার," সে আমার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকায়। এত ফুলের ভিড়ে দাঁড়িয়ে তার স্যার কেন অমন আর্তনাদ করছেন, তা বোধ হয় বুঝে উঠতে পারেনি।

"এগুলো কী?" আমি তখন ঘামছি, কোনও মতে আঙুল তুলে ছোট-ছোট সাদা ফুলগুলোকে দেখাই।

সে অবাক, "ঘাসফুল স্যার!"

"ঘাসফুল," কী করব ঠিক বুঝতে না পেরে ওর উপরই রেগে যাই, "এ বাগানে ঘাসফুল কেন?"

"স্যার," প্রতাপ থতমত খেয়ে কিছু বলতে যায়। কিন্তু তার আগেই ওকে থামিয়ে দিয়েছি, "এক্ষুনি কেটে ফ্যালো। এক্ষুনি, ইমিডিয়েটলি। এখানে আর একটাও ঘাসফুল দেখতে চাই না আমি।"

ভাবলার মতো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে সে মাথা নাড়ল।

"আর হ্যাঁ, ওগুলো ছেঁটে ফেলার আগে মুখে মাস্ক পরে নেবে। নাকে যেন গন্ধ না যায়। বুঝেছ?"

আমি আর ওখানে দাঁড়াই না। মোরাম বিছানো পথ দিয়ে বাড়ির দিকে হাঁটতে-হাঁটতে দেখি, প্রতাপ কিছুক্ষণের জন্য হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর এক কোণের স্টোররুম থেকে কাটারি নিয়ে এল। আমার কথা অবজ্ঞা করেনি। গামছা দিয়ে নাক পেঁচিয়ে বেঁধেছে।

স্বস্তির নিশ্বাস পড়ল। প্রতাপ কী ভাবল, কে জানে। হয়তো ভাবল, স্যারের মাথার ছিট। যাই ভাবুক। এই ফুলগুলো তো আর ওখানে থাকবে না।

ঘরের তালা খুলে ভিতরে ঢুকতেই একটা ভ্যাপসা গন্ধ। সব সময় বন্ধ থাকলে যা হয় আর কী। সকালে চাউমিন খেয়ে বেরিয়েছিলাম। তার সসের গন্ধ এখনও নাকে ঝাপটা মারছে।

ভীষণ বিরক্ত লাগল। আমার কাজের লোক মদন এক নম্বরের ফাঁকিবাজ। আমিও বেরিয়েছি, অমনি সেও দরজা-জানলা বন্ধ করে পাড়া ঘুরতে বেরিয়েছে। দিনভর শুধু এখানে-

ওখানে টো-টো করে ঘুরে বেড়ায়। অবশ্য আমার ফেরার আগেই সচরাচর ফিরে আসে। আজ তাড়াতাড়ি চলে এসেছি। ফলস্বরূপ মদনের দেখা নেই।

অগত্যা আপনা হাত জগন্নাথ। প্রথমেই জানলাগুলো সব খুলে দিলাম। তাকের উপর রুম ফ্রেশনারটা ছিল। স্প্রে করতে গিয়ে দেখি ফসফস আওয়াজ হচ্ছে। ওটা শেষ।

এমন সময়ই শেষ হতে হল! বাধ্য হয়েই আমার দামি পারফিউমটা স্প্রে করে দিলাম। অন্তত এই অসহ্য ভ্যাপসা গন্ধটা তো যাবে। মনে-মনে তখন মদনের পূর্বপুরুষের শ্রাদ্ধ করে চলেছি। আশ্চর্য! রুম ফ্রেশনারটা যে শেষ হয়ে গিয়েছে, সেটাও তার খেয়াল নেই। নতুন কিনে আনা তো দূর। এত টাকা দিয়ে ওকে রেখেছি কেন আমি?

মনে-মনে রেগে উঠি। একবার ফিরুক হতভাগা, তারপর ওর হচ্ছে।

ভীষণ খিদে পেয়েছিল। তাড়াতাড়ি কোনওমতে গায়ে দু' মগ জল ঢেলে এলাম। শরীর আর মাথা তো ঠান্ডা হল। কিন্তু পেটের ভিতরে ইঁদুরের রেস চলছে। মদন কখন ফিরবে, তার ঠিক নেই। তাই নিজের হাত পুড়িয়েই কিছু বানিয়ে নিতে হবে। ফ্রিজে হয়তো এক-দু' টুকরো ব্রেড এখনও আছে। তার সঙ্গে ডিমের একটা অমলেট আর চা যথেষ্ট।

রান্নাঘরে ঢুকে বুঝলাম যে, কাজটা যতটা সহজ মনে হচ্ছিল, ঠিক ততটা নয়। ফ্রিজ থেকে পাউরুটি আর ডিম উদ্ধার করা গেলেও চায়ের পাতা, চিনি কোথায় রাখা থাকে, কিছুই জানি না। তাকের উপর সারি-সারি শিশি। তার কোনওটায় চিনি, কোনওটায় নুন, কোনওটায় কী, সেসব সম্পর্কে কোনও জ্ঞানই নেই। নিজের কিচেনের চেয়ে বরং ল্যাবরেটরিটা আমার কাছে অনেক বেশি চেনা।

প্রায় অসহায়ের মতোই তন্নতন্ন করে খুঁজছি সব উপকরণ। খুঁজতে-খুঁজতেই রান্নাঘরের জানলাটার সামনে এলাম।

ঠিক তখনই একটা অদ্ভুত মিষ্টি গন্ধ নাকে এল।

অদ্ভুত মিষ্টি একটা গন্ধ! এমন গন্ধ তো আগে কখনও পাইনি। কেমন যেন নেশা ধরানো সুবাস।

আমার ইন্দ্রিয়গুলো সব সতর্ক হয়ে উঠল। এটা কিসের গন্ধ? রান্নাঘরের জানলা দিয়ে ফুরফুর করে হাওয়া আসছে। তার সঙ্গে-সঙ্গেই গন্ধটা ঝাপটা মেরে ঢুকে পড়ছে। খুব তীব্র নয় কিন্তু...।

ক্যামুফ্লেজিয়ার গন্ধ কেমন, তা জানি না। ডেমনস্ট্রেশনের সময় নাকে মাস্ক পরেছিলাম। কিন্তু শুনেছি গন্ধটা মিষ্টি।

গন্ধটা কী এই রকম? কিসের গন্ধ এটা? ক্যামুফ্লেজিয়ার?

"প্রতাপ...প্র-তা-প!" প্রায় মৃত্যুভয়েই আর্তচিৎকার করে উঠেছি। বুকের ভিতরটা কেমন-কেমন করছে। একটা বিরাট টারবাইনের মতো ধপ ধপ করে চলছে। ভীষণ রকমের আকুলিবিকুলি। বোধ হয় এখনই হার্ট ফেল করব। আর সময় নেই। সেই মারাত্মক মারণাস্ত্র আজ আমায় শেষ করেই ছাড়বে।

"স্যার-স্যার।"

প্রতাপ বোধ হয় ঘাসফুল পরিষ্কার করতেই ব্যস্ত ছিল। চিৎকার শুনে কাটারি হাতেই ব্যস্তসমস্ত হয়ে ছুটে এসেছে।

"কী হয়েছে স্যার?"

ভয়ে গলা কাঁপছে। কোনওমতে বললাম, "ওটা কিসের গন্ধ?"

প্রতাপ জোরে-জোরে বেশ কয়েকবার নিশ্বাস নিয়ে গন্ধটা শুঁকল। আমি প্রায় দমবন্ধ করে রেখেছি। কিছুতেই ওই বিষ-নিশ্বাস নেব না আমি, কিছুতেই না।

"ওঃ," সে গন্ধটা অনুধাবন করেই হেসে ফেলেছে, "এটা তো জুঁই ফুলের গন্ধ।"

"জুঁই ফুল?" আমি নিঃসন্দেহ হতে পারি না। কে বলতে পারে, ক্যামুফ্লেজিয়ার ডিএনএ গঠনে হয়তো জুঁই ফুলের অবদানও আছে। হয়তো তার গন্ধটা জুঁই ফুলের মতোই।

"জুঁই ফুলের গন্ধ? এখানে জুঁই ফুলের গন্ধ কোথা থেকে আসবে?"

প্রতাপ আমার অবস্থা দেখে অবাক হয়। আস্তে-আস্তে বলে, "আপনার মনে নেই স্যার? আপনিই তো চারাগাছটা নিয়ে এসেছিলেন। বাগানে জায়গা ছিল না বলে রান্নাঘরের পিছনেই লাগিয়েছিলাম আমি।"

"কেটে ফ্যালো।"

সে বোধ হয় আমার কথার মাথামুন্ডু বুঝতে পারল না। কেমন বেকুবের মতো দাঁড়িয়ে আছে। বোধ হয় বুঝতে পারছে না যে, কী করবে।

"একদম গোড়া থেকে কেটে ফ্যালো," আমি জোরালো গলায় বলি, "জুঁই ফুলের গাছ চাই না আমার। একদম উপড়ে ফ্যালো। এই গন্ধ যেন আর আমি না পাই।"

সে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে আস্তে-আস্তে মাথা নাড়ে।

"ঘাসফুলগুলো সব ছেঁটে দিয়েছ?"

"হ্যাঁ।"

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলি, "ঠিক আছে। এটাকেও...।"

"ঠিক আছে স্যার।"

প্রতাপের মুখ বিষণ্ণ। বাগানের প্রত্যেকটা ফুল, গাছ তার বড় প্রিয়। বড় যত্নে, প্রায় সন্তানের মতো করেই সে বড় করে তুলেছে প্রত্যেকটা গাছ। আর আজ তাকেই আমি সেগুলো কেটে ফেলার নির্দেশ দিচ্ছি।

মনে হল ওকে কষাইয়ের কাজ দিয়েছি। একবার মনে হল,

ডেকে বারণ করে দিই। পরক্ষণেই মনকে বোঝাই। কেউ বলতে পারবে না, কেউ বলতে পারে না, হয়তো এই নিরীহ ফুলের মধ্যেই নিরীহতর মুখ করে বসে আছে ক্যামুফ্লেজিয়া। আমায় শেষ করার মতলবে বিষ-সৌরভ ছড়াচ্ছে।

তখনও হাত-পা কাঁপছিল। কোনওমতে আবার বসার ঘরে ফিরে আসি। আজ আর রান্না করার মতো অবস্থা নেই। কোনও শুকনো পাউরুটি আর জল খেয়েই চালাতে হবে।

কিছুক্ষণ বসে থাকার পর মনে হল, একটু ধাতস্থ হয়েছি। আস্তে-আস্তে উঠে ল্যাপটপটাকে নিয়ে এলাম। অনেক কাজ পড়ে আছে। ডঃ হিঙ্গোরানির জন্য কিছু প্রোজেক্ট রিপোর্ট তৈরি করতে হবে। ডক্টর কাজে গাফিলতি একদম বরদাস্ত করেন না।

ল্যাপটপে এক মনে কাজ করতে-করতে মগ্ন হয়ে গিয়েছিলাম। কখন যে বাইরে ঘন অন্ধকার নেমে এসেছে, তা খেয়াল নেই। ক্যামুফ্লেজিয়ার কথা মাথা থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। হুঁশ ফিরল মদনের ডাকে, "বাবু!"

আগে ভেবেছিলাম, ও এলে একচোট বকাবকি করব। কিন্তু এখন সে ইচ্ছেটা আর টের পেলাম না।

"আপনি আজ তাড়াতাড়ি ফিরেছেন।" সে এক হাত জিভ কাটে, "কিছু খাননি নিশ্চয়ই।"

আমি শান্ত গলায় বলি, "খেয়েছি।"

সে আবার জিভ কাটল। কার উদ্দেশে কে জানে, "রাতে কী খাবেন বাবু?"

"রুটি কর," একটু ভেবে জবাব দিই, "আর ডিম কষা হলেই চলে যাবে।"

"আচ্ছা," ও চলে যাচ্ছিল। আমি পিছন থেকে ডাকি, "শোন।"

"হ্যাঁ বাবু।"

"রুম ফ্রেশনারটা শেষ হয়ে গিয়েছে। দোকান থেকে একটা নিয়ে আসিস।"

"অকে।"

'অকে'টা 'ওকে'-এর মদনীয় সংস্করণ। আমাকে প্রায়ই 'ওকে' বলতে শোনে। সেখান থেকেই রপ্ত করেছে।

মদন চলে গেল রান্নাঘরে। আমি আবার কাজে মন দিলাম। প্রোজেক্ট রিপোর্ট শেষ করতে-করতেই রাত দশটা বাজল। তারপর কয়েকটা ই-মেল পাঠালেই আজকের মতো কাজ শেষ।

ঘড়িতে ঢং ঢং করে দশটার ঘণ্টা পড়ছে। আমি প্রায় ল্যাপটপের মধ্যে মাথা গুঁজে ই-মেল টাইপ করছি, ঠিক তখনই মোবাইল ফোনটা তীব্র স্বরে বেজে উঠল।

একটু বিরক্ত হলাম। কাজের সময়ে ফোন বাজলে ভীষণ বিরক্ত লাগে। এখনও সাতটা ই-মেল পাঠাতে হবে আমায় দেশ-বিদেশের নানা বিজ্ঞানীকে। লম্বা-লম্বা বয়ানের চিঠি। সময় লাগবে। তার উপর একটাও স্পেলিং মিসটেক হওয়া চলবে না। একটা বানান ভুল হলেও ডক্টর আমায় বকাবকি করে আস্ত রাখবেন না। যথাসম্ভব সতর্ক হয়ে কাজ করছি।

এমন সময় কে আবার জ্বালাতে ফোন করল?

প্রথমে ভেবেছিলাম ফোন ধরব না। কিন্তু আড়চোখে তাকিয়ে দেখি, ফোনের ডিস প্লে-তে জ্বলছে-নিভছে 'কলিং গৌতম'।

আমার মনে একটা তীব্র আশঙ্কা উন্মত্তের মতো নাচতে শুরু করল। গৌতম এখন ফোন করছে কেন? সচরাচর সে খুব একটা ফোন করে না। যা কথা হওয়ার, তা ল্যাবেই হয়। আজও বেরিয়ে আসার আগে ওকে সমস্ত কাজকর্ম বুঝিয়ে দিয়ে এসেছি। ডঃ হিঙ্গোরানি ল্যাবে আছেন। আমি আজ একটু তাড়াতাড়ি চলে এসেছি বলে ওকে ডিউটিতে থাকতে হয়েছে।

কিন্তু সে ফোন করছে কেন? আবার কী হল?

তাড়াতাড়ি ফোনটা ধরি, "হ্যালো।"

ও প্রান্ত থেকে ভেসে এল গৌতমের ভাঙা-ভাঙা উত্তেজিত স্বর, "স্যার?"

"বলছি, বলো।"

ঠিক হাহাকারের মতো শোনাল তার কথাগুলো, "ডঃ হিঙ্গোরানি ল্যাবে কাজ করতে-করতেই অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। অসম্ভব ব্রিদিং ট্রাবল। নিশ্বাস নিতে পারছেন না। আমি ওঁকে লাইফ কেয়ার নার্সিংহোমে নিয়ে যাচ্ছি। আপনি ইমিডিয়েটলি চলে আসুন।"

আমার ব্রহ্মতালু থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত যেন বরফ হয়ে গেল। হাতটা ভীষণ অবশ লাগছে।

ফোনটা ঠক করে হাত থেকে পড়ে গেল মেঝেতে।

ব্রিদিং ট্রাবল না আবার ক্যামুফ্লেজিয়া!

॥ ৪ ॥

লাইফকেয়ারের আই সি ইউতে গভীর কোমায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলেন ডঃ হিঙ্গোরানি। ভেন্টিলেশন চলছে। ডাক্তারবাবু প্রথমে ভিতরে কাউকে অ্যালাউ করছিলেন না। অনেক কাকুতিমিনতির পর আমাকে কয়েক মুহূর্তের জন্য কাছে যাওয়ার অনুমতি দিলেন।

ডঃ হিঙ্গোরানির পাশের বেডটাতেই ডঃ সুকুমার বসু শুয়ে আছেন। তিনিও কোমায় আছেন। মুখটা বিবর্ণ। কেউ যেন ব্লটিং পেপার দিয়ে সমস্ত রং শুষে নিয়েছে। চোখ দু'টো আঠা দিয়ে যেন আটকানো। অসম্ভব তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল ডঃ বসুর। ভারী কাচের চশমার ফাঁক দিয়ে যখন তাকাতেন, তখন মনে হত একেবারে ভিতর পর্যন্ত দেখে নিচ্ছেন।

অথচ এই চোখ দু'টো হয়তো আর কখনও খুলবেন না।

আর তাঁর পাশেই ডঃ হিঙ্গোরানি!

অমন দাপুটে মানুষটাকে এত অসহায় আগে কখনও মনে হয়নি। কী শীতল নিরাপত্তাহীনতায় পড়ে আছেন বিছানায়। মুখে মৃত্যুর পাণ্ডুর ছায়া।

কেন জানি না, বদিও আমি খুব শক্ত মানুষ। আমি বাবার মৃত্যুতেও কাঁদিনি। কিছুতেই আমার চোখে জল আসে না। কিন্তু আজ কেঁদে ফেললাম। ডঃ হিঙ্গোরানির দিকে তাকিয়ে চোখ জলে ভরে এল। আর নিজেকে সামলাতে পারি না। কোনওমতে আই সি ইউ থেকে টলতে-টলতে বেরিয়ে এসেছি।

গৌতম বাইরেই দাঁড়িয়ে ছিল। আমার অবস্থা দেখে সে ভুলে গেল যে, আমি ওর স্যার। সঙ্গে-সঙ্গে এগিয়ে এসে জড়িয়ে ধরেছে আমাকে।

"স্যার।"

ওইটুকু বলারই অপেক্ষা ছিল। ওর বুকে মাথা রেখে ছোট শিশুর মতো হাউ হাউ করে কান্নায় ভেঙে পড়লাম। ওর চোখেও জল। ডঃ হিঙ্গোরানিকে ভালবাসে না, এমন লোক বোধ হয় নেই। ভীষণ মেজাজি লোক ঠিকই, কিন্তু দয়ামায়া কাকে বলে তা বোধ হয় ওঁর কাছ থেকেই শিখতে হয়। কী ছিলাম আমি? কতটুকু ছিলাম? বিজ্ঞানী হওয়ার স্বপ্ন ছিল চোখে। কিন্তু সংস্থান ছিল না। বাবার সামান্য রোজগারে স্বপ্ন সফল হওয়ার সম্ভাবনাই ছিল না। সেই সময় ডঃ হিঙ্গোরানিই আমার হাত ধরেছিলেন। ঈশ্বর সকলের জীবনেই একজন না-একজন দেবদূত পাঠান।

আমার সেই দেবদূত এখন আই সি ইউতে গভীর কোমায় আচ্ছন্ন হয়ে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে।

অথচ আমার কিছু করার নেই। কী অসহায় আমি!

গৌতম বিড়বিড় করে যেন আপন মনেই বলে, "ফুলের বোকেটার জন্যই এ সর্বনাশ।"

আমি ওর কথাটা ঠিক ধরতে পারি না। অবাক হয়ে তাকিয়ে আছি দেখে সে আবার বলল, "আপনি চলে যাওয়ার প্রায় তিন ঘণ্টা পরে একটা ফুলের বোকে এসেছিল স্যার।"

আমার চোয়াল শক্ত হয়ে ওঠে। বুঝতে অসুবিধে হল না যে, গৌতমের সন্দিগ্ধ ইঙ্গিত কোন দিকে।

"ক্যামুফ্লেজিয়া?"

ও আমার দিকে তাকিয়ে সম্মতিসূচক মাথা নাড়ে।

"আপনি বুঝতে পারছেন না স্যার?" ফিসফিস করে বলল গৌতম, "পরপর ইনসিডেন্টগুলো দেখুন। সব ক'টা সিম্পটম দেখুন। যখন আমি ডঃ হিঙ্গোরানির চিৎকার শুনে ছুটে যাই, তখন ওঁর নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল। সবচেয়ে বড় কথা যে, উনি কনফিউজড্ হয়ে গিয়েছিলেন। নার্সিং হোম শব্দটাও ঠিক মতো বলতে পারছিলেন না। একবার জল খেতে চাইছিলেন, কিন্তু যখন জল দিতে গেলাম, তখন জলের দিকে এমন করে তাকালেন যেন জিনিসটা কী, বুঝতে পারছেন না। এখানে আসার পর ডক্টর বললেন, "মেজর কেস অফ অ্যাসিস্টল। কোনও কার্ডিয়াক ইলেকট্রিক্যাল অ্যাকটিভিটি ছিল না তখন।"

ও চুপ করে থাকে কিছুক্ষণ। বলাই বাহুল্য যে এই হার্ট অ্যাটাক, সাইনাস ট্যাকিকার্ডিয়া, ভেন্ট্রিকুলার অ্যারিদমিয়া, কনফিউশন এবং অ্যাসিস্টল, এগুলো সব অ্যাকোনিটামের লক্ষণ। ক্যামুফ্লেজিয়াই যে সব কিছুর মূলে, তা বুঝতে আর বাকি রইল না।

"বোকেটা কে পাঠিয়েছিল জানো?"

"নাঃ," সে বলে, "বোকেটার উপর কোনও নাম ছিল কি না মনে নেই। একগুচ্ছ নানা রঙের ফুলের বোকে ছিল, শুধু এইটুকু মনে আছে। আর যখন ডঃ হিঙ্গোরানি পড়ে গিয়ে ছটফট করছিলেন, তখন তাঁর পাশেই পড়েছিল বোকেটা।"

"ফাইন!" আমি তড়াক করে উঠে দাঁড়াই, "চলো গৌতম।"

"কোথায়?"

"অফিসে," অজান্তেই নিজের চোয়াল শক্ত হয়ে উঠেছে, "বোকেটা কে পাঠিয়েছে দেখা দরকার। লেট্স গো।"

গৌতম প্রথমে একটু কিন্তু-কিন্তু করলেও পরে রাজি হয়ে গেল। ওর গাড়িতেই আমরা ফিরে গেলাম ল্যাবে। ল্যাবরেটরির একটা চাবি সব সময় আমার সঙ্গেই থাকে। সুতরাং ভিতরে ঢুকতে কোনও অসুবিধে হয়নি।

কিন্তু অবাক কাণ্ড! পুরো ল্যাবরেটরি তন্নতন্ন করে খুঁজেও পাওয়া গেল না বোকেটা। সেটা যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গিয়েছে। যে ঘরে ডক্টর পড়ে ছিলেন, সে ঘর থেকে শুরু করে ডাস্টবিন পর্যন্ত আমরা সব খুঁজে-খুঁটে দেখলাম। কিন্তু ফুলের তোড়াটা অধরাই থেকে গেল।

অনেকক্ষণ খোঁজার পর যখন আমরা হতক্রান্ত হয়ে রণে ভঙ্গ দিলাম, ততক্ষণে প্রায় ভোর হয়ে এসেছে। গৌতম রীতিমতো হাঁপাচ্ছে। কোনওমতে হাঁপাতে-হাঁপাতে বলল, "কেউ সরিয়ে নিয়েছে। আমি শিওর বোকেটা এখানেই পড়ে ছিল। কিন্তু কেউ...।"

"কে?"

সে খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে। কী যেন ভাবছে। একটু সময় নিয়ে আবার বলল, "একটা কথা মনে হচ্ছিল স্যার।"

আমি ল্যাবরেটরির টেবিলে রাখা বোতল থেকে জল খেতে-খেতে বলি, "কী?"

"ডঃ টোডি, ডঃ বসু ও ডঃ হিঙ্গোরানির মতো লোক এত বড় একটা কাঁচা কাজ করলেন কী করে?"

"মানে?"

"মানে কোনও অ্যান্টিডোটের বন্দোবস্ত না করেই ক্যামুফ্লেজিয়ার মতো বিষধর জিনিস আবিষ্কার করবেন, এত বড় মূর্খ কি তাঁরা ছিলেন?"

আমি গৌতমের দিকে অপলকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকি। এই কথাটা এতক্ষণ আমার মাথায় আসেনি কেন?

"কিন্তু অ্যান্টিডোট যদি থাকে, তবে সেটা তাঁরা নিজেরা ব্যবহার করেননি কেন?"

গৌতমকে কথাটা বলতেই ওর উত্তর, "হয়তো সুযোগ পাননি। বোঝার আগেই বিষ কাজ করতে শুরু করেছে।"

"হতে পারে," আমি উত্তেজিত, "তা হলে সেক্ষেত্রে তার অ্যান্টিডোট এখানেই থাকবে। হয় অ্যান্টিডোট, কিংবা তার ফরমুলা। যতদূর জানি অ্যাকোনিটামের অ্যান্টিডোট হিসেবে নাক্স ভম কিংবা ক্যাম্ফর ইউজ হয়। একবার গোটা ফরমুলাটা পেয়ে গেলে বানিয়ে নিতেও অসুবিধে হবে না। চিয়ার আপ। খোঁজো গৌতম, খোঁজো।"

শুরু হল খোঁজাখুঁজি। গৌতম আর আমি দু'জনেই বুঝতে পারছিলাম যে, ক্যামুফ্লেজিয়ার প্রকোপ এর পর আমাদের উপরই পড়বে। আমাদের অবস্থাও ডঃ টৌডি, ডঃ বসু বা ডঃ হিঙ্গোরানির মতো হবে। তাই অ্যান্টিডোট কিংবা তার ফরমুলাটা পাওয়া আমাদের কাছে জীবনমরণ সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। দু'জনেই মরিয়া হয়ে খুঁজছি। যে-কোনও মূল্যেই হোক, জিনিসটা পেতেই হবে। নয়তো আমাদেরও শেষ করে ছাড়বে ওই ছদ্মবেশী ঘাতক।

ডঃ হিঙ্গোরানির প্রাইভেট ল্যাব আজ খোলা ছিল। উনি অসুস্থ হয়ে পড়ায় এই দরজা বন্ধ হয়নি। আর কেউ পাসওয়ার্ড জানত না।

মনে হল হয়তো ডক্টর অ্যান্টিডোটটাও ওই ঘরেই রেখেছেন।

"গৌতম, তুমি বাইরেটা খোঁজো," আমি প্রাইভেট ল্যাবের দিকে পা বাড়াই, "আমি ভিতরটা দেখছি।"

ল্যাবের ভিতরে সারি-সারি শিশিতে নানারকম কেমিক্যাল। কোনওটা সবুজ, আবার কোনওটা বা গোলাপি। ছোট-ছোট কাচের শিশিতে নানারকম তরল। এত শিশি আর বোতলের মাঝখানে দাঁড়িয়ে নিজেকে ভীষণ অসহায় মনে হচ্ছিল। এর কোনটায় আমাদের ঈপ্সিত বস্তু লুকিয়ে আছে? অ্যান্টিডোট ছাড়া ফুলটা তৈরি হল কী করে? যখন এটা তৈরি হচ্ছিল, তখন থেকেই নিশ্চয়ই বিজ্ঞানীরা গ্যাস মাস্ক পরে ছিলেন না। ক্যামুফ্লেজিয়ার গন্ধ কখনও না-কখনও তাদের নাকে গিয়েই থাকবে। মনে আছে ডঃ হিঙ্গোরানি বলেছিলেন, "গন্ধটা মিষ্টি।" যদি গন্ধ তাঁদের নাকেই না যায়, তবে বুঝলেন কী করে যে, গন্ধটা মিষ্টি?

দৃঢ় বিশ্বাস হল, তার মানে অ্যান্টিডোট আছে। গবেষণা চলাকালীন বিজ্ঞানীরা ফুলের গন্ধও পেয়েছিলেন। কিন্তু তখন তাঁদের কিছু হয়নি। অ্যাকোনাইট কাজ করতে বেশি সময় নেয় না। এক ঘণ্টা-দু' ঘণ্টার মধ্যেই কাম খতম করে ফ্যালে। সুতরাং তখন তাঁরা নিশ্চয়ই অ্যান্টিডোট নিয়েছিলেন। ওটা এখানেই কোথাও আছে।

কিন্তু কোথায়?

ল্যাবের ভিতরে একটা মস্ত বড় ফ্রিজার। মাইনাস সিক্স ডিগ্রিতে সেট করা আছে। এটাকে মাইনাস ফরটি ডিগ্রি পর্যন্ত সেট করা যায়। গ্লাভস পরে ফ্রিজারের দরজা খুলতেই হাড় হিম করা ধোঁয়া বেরিয়ে এল। সেই ধোঁয়ার ভিতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে আরও কিছু ছোট-ছোট শিশি। গায়ে লেবেল সাঁটা। সামনের ব্লকে বড়-বড় করে লেখা, 'অ্যান্টিডোট্স'।

এগুলোই অ্যান্টিডোট। নানা বিষ নিয়ে কাজ করেন ডক্টর। তাই প্রত্যেকটা বিষের ওষুধও তৈরি করা থাকে। সারসার শিশির মধ্যে আর্সেনিক অ্যান্টিডোট, থ্যালিয়াম অ্যান্টিডোট,

সায়ানাইড অ্যান্টিডোট, নিউরোটক্সিন এলডি ফিফটির অ্যান্টিডোট, সবই চোখে পড়ল।

কিন্তু ক্ল্যামুফেজিয়া নেই।

আশ্চর্য ব্যাপার। ক্যামুফ্লেজিয়ার অ্যান্টিডোট এখানে নেই কেন? তবে কি অন্য কোথাও?

প্রথমে সব ক'টা শিশি নামিয়ে-নামিয়ে দেখলাম। নেই! ল্যাবরেটরি প্রায় তছনছ করে খুঁজছি। নেই! কাগজপত্র, ফাইল ঘেঁটে দরকারি-অ-দরকারি কাগজ ছড়িয়েছিটিয়ে একশা করলাম। আমারই তৈরি করা প্রোজেক্ট রিপোর্ট, ডিফেন্স মিনিস্ট্রির চিঠি, ক্যামুফ্লেজিয়ার ইনসিওরেন্স পেপার সব বেরোল।

কিন্তু ফরমুলা?

নেই!

হতক্লান্ত হয়ে মেঝের উপরই বসে পড়েছি। আবার ভীষণ কান্না পেয়ে গেল। ডঃ হিঙ্গোরানির জন্য নয়। নিজের কথা ভেবে। শেষ পর্যন্ত আমাকেও বিষ-নিশ্বাস নিয়ে অসহায় গিনিপিগের মতো মরতে হবে। চোখের সামনে দেখলাম, ক্যামুফ্লেজিয়া আমার পিছনে ধাওয়া করছে। নীল বিষাক্ত শরীরে আমি...

নাঃ। এভাবে এত সহজে মরব? আমিও বিজ্ঞানী। এই কাগজপত্রের মধ্যে আর কিছু না হোক, কোথাও না-কোথাও ক্যামুফ্লেজিয়ার ডিএনএ কোড রয়েছে। যদি একবারও সেটা পাই, তবে নিজেই তার অ্যান্টিডোট তৈরি করতে পারি। শুধু একবার ঠান্ডা মাথায় আমার কাগজটা দেখতে হবে।

ফাইলের মধ্যে সমস্ত কাগজপত্র নিয়ে বেরিয়ে এলাম প্রাইভেট ল্যাব থেকে। গৌতম ততক্ষণে সমস্ত ডিভিডি, সিডি চালিয়ে দেখে নিয়েছে। কম্পিউটার তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখেছে। ডঃ টোডি, ডঃ বসু আর ডঃ হিঙ্গোরানির নিজস্ব কম্পিউটার তাদের কেবিনেই থাকে। সব ক'টা দেখেছে, এমনকী, আমার কম্পিউটারও ছাড়েনি, যদি কোনও সিডিতে বা কম্পিউটারে ক্যামুফ্লেজিয়ার প্রেজেন্টেশন থাকে কিংবা তার অ্যান্টিডোটের প্রেজেন্টেশন। আজকাল বিজ্ঞানীরা কম্পিউটারেই তাঁদের রেকর্ড বেশি রাখেন। তাই সে তাও দেখতে বাকি রাখেনি।

কিন্তু ডঃ হিঙ্গোরানিকে আমি হাড়ে-হাড়ে চিনি। তিনি কম্পিউটারে কিছু রাখার লোক নন।

দেখা গেল আমার চেনাটাই সঠিক। গৌতম সব কম্পিউটার ঘেঁটেও কিছু পায়নি। হয় সেগুলো কেউ সরিয়ে দিয়েছে, নয়তো ডক্টররা কম্পিউটারে জিনিসটা রাখেননি।

"এখন কী করব স্যার?" তার কণ্ঠস্বরে হতাশা, "কিছুই তো পেলাম না।"

"পাওয়া যাবে গৌতম, নিশ্চয়ই পাব আমরা," ওকে সান্ত্বনা দিই, "আমি বাড়িতে বসে ঠান্ডা মাথায় এই কাগজপত্রগুলো দেখব। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এর মধ্যেই কিছু আছে। যদি ক্যামুফ্লেজিয়ার ডিএনএ কোডও পেয়ে যাই, তবে তা থেকে অ্যান্টিডোট বানিয়ে নিতে পারি। শুধু এই মুহূর্তে মাথা ঠান্ডা রাখা দরকার।"

সে ক্লান্ত ভাবে মাথা নাড়ে।

"এখন তুমি বাড়ি যাও," আমি আস্তে-আস্তে বললাম, "সকাল দশটার আগে তো ভিজিট করতে দেবে না। আমিও আসব।"

গৌতম সম্মতিসূচক ভাবে মাথা নাড়ল, "চলুন স্যার, আপনাকে বাড়িতে ড্রপ করে দিই।"

"চলো।"

বাড়ি ফিরতে-ফিরতে সকাল সাতটা বাজল। সারারাত জেগে, খোঁজাখুঁজি করে দু'জনেই ভীষণ অবসন্ন হয়ে পড়েছি। বিশ্রাম দরকার। ফেরার পথে আমাদের দু'জনের কোনও কথা হয়নি। কোনও এক ভয় আমাদের তাড়া করে বেড়াচ্ছিল। আমি অন্যমনস্ক ভাবে ফাইলের কাগজ উলটে-পালটে দেখছিলাম। গৌতম ড্রাইভ করছিল। কোনও কথা বলেনি। আমাদের আশঙ্কা একটা ভীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। আমাকে ড্রপ করার সময় গৌতমই প্রথম মুখ খুলল, "আমার মনে হয় স্যার, কেউ সব রেকর্ড মুছে দিয়েছে। আমাদের মধ্যেই কেউ। আর বোধ হয় বাঁচার উপায় নেই।"

দেখলাম, ওর উদ্‌ভ্রান্ত চোখে জল চিকচিক করছে। আমারও মনে এই সন্দেহটা ঘুরছিল। কেউ ইচ্ছাকৃত ভাবেই সরিয়ে ফেলেছে অ্যান্টিডোট। হয়তো কাগজপত্রও গায়েব করে দিয়েছে। বুঝতে পারছিলাম না, ওকে কী বলব। কিছু বলার আগেই সে আবার বলল, "আপনি স্যার সাবধানে থাকবেন।"

গৌতম চলে গেল। আমি নিজের বাড়ির দিকে পা বাড়ালাম। একটু বিশ্রাম দরকার। ক্লান্তিতে শরীর ভেঙে আসছে। একটু ঘুম।

কিন্তু এ কী! বাগানের পাশ দিয়ে যেতে-যেতেই চমকে উঠলাম। কাল প্রতাপকে বলেছিলাম ঘাসফুলগুলো ছেঁটে ফেলতে। ওকে কাটারি দিয়ে ঘাসফুল ছাঁটতে দেখেছি। তবে ওগুলো কী? বাগান আলো করে ঘাসের মধ্যে ছোট-ছোট সাদা ফুল শিশির মেখে ঝলমল করছে। কাল সংখ্যায় কম ছিল, কিন্তু আজ প্রায় গোটা বাগান জুড়েই। ফুলগুলো বোধ হয় আমার দিকে তাকিয়ে ব্যঙ্গের হাসি হাসছে। এত তাড়াতাড়ি এত ঘাসফুল কোথা থেকে এল?

ইনসিওরেন্স আছে। তার কাগজপত্র, ডিফেন্সের চিঠি, কিছু কেমিক্যাল কেনার রসিদের কপি, অ্যাকোনিটাম কেনার রশিদ। দেখতে-দেখতেই চোখে পড়ল একটা কাগজে কী যেন হিজিবিজি লেখা। কোনও সন্দেহ নেই যে, এটা ডক্টর হিঙ্গোরানির হাতের লেখা। এমন দুর্বোধ্য হিব্রুর মতো হাতের লেখা তাঁর ছাড়া আর কারও নয়।

কিন্তু এসব কী হিজিবিজি এঁকেছেন? দেখে মনে হচ্ছে একটা প্ল্যানিং। ডিএনএ কোডের প্ল্যানিং? উত্তেজনায় শরীর টানটান হয়ে উঠল। এত খোঁজাখুঁজির পর শেষ পর্যন্ত পাওয়া গেল। কিন্তু এ কী! এর মধ্যে অ্যাকোনিটামের ডিএনএ তো দেখছি না। বরং কিছু সাপের বিষের সাইকেল দেখা যাচ্ছে। ক্যামুফ্লেজিয়া সাপের বিষ দিয়ে তৈরি। ডক্টর হিঙ্গোরানি কি তবে ভুল বলেছিলেন, বা চেপে গিয়েছিলেন আমাদের কাছে আসল সত্যিটা?

আমি ভাল করে কাগজটা দেখতে চাইছিলাম। কিন্তু ক্রমশই শরীরটা কেমন যেন অবসন্ন হয়ে আসছে। গোলাপের গন্ধটা আরও তীব্র। ভীষণ অসুস্থ মনে হল নিজেকে। চোখে ঝাপসা দেখছি, বুক ধড়ফড় করছে। সব দরজা, জানলা বন্ধ। তা হলে গোলাপের গন্ধ আসছে কোথা থেকে। মদন কি ঘরে কোনও গোলাপ এনে রেখেছে? আমি পানীয়র গ্লাসে কয়েকবার উত্তেজিত চুমুক লাগাই, তারপর ফয়েল থেকে আরও কয়েকটা অ্যালার্জির ওষুধ খেয়ে ফেলি টপাটপ। অ্যালার্জিটা ক্রমশই বাড়ছে। দেখতে হবে, কোথায় গোলাপ রাখা আছে। অদ্ভুত ব্যাপার! সমস্ত ঘর খুঁজেও কোথাও গোলাপের একটা পাপড়ি তো দূরের কথা, একটা কাঁটাও নজরে এল না। তবে?

আবার একটা আশঙ্কা মনের মধ্যে চেপে বসল। ক্যামুফ্লেজিয়ার গন্ধ কি তবে গোলাপের মতো? ক্রমশই মনে হচ্ছে বুকের উপর কিসের যেন একটা ভয়ানক চাপ। শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। চোখের সামনে সব ঝাপসা হয়ে আসছে। আমি জোরে-জোরে শ্বাস নিতে শুরু করি। কিন্তু পারছি না। দেহ অবশ হয়ে আসছে। প্রচণ্ড বমি পাচ্ছে, দরদর করে ঘামছি। বুঝতে পারছি এ যাত্রায় বোধ হয় আর বাঁচব না। নার্ভগুলো কাজ করা ছেড়ে দিয়েছে, বুকে ভীষণ কষ্ট। এ নির্ঘাত ক্যামুফ্লেজিয়া সিম্পটম। কিন্তু কোথায়? আমার বাগানে আর কোনও ফুল নেই। আশপাশে কোনও ফুল চোখে পড়েনি। ভেবেছিলাম, ক্যামুফ্লেজিয়াকে আমি অনেক দূরে ফেলে আসতে পেরেছি।

অক্সিজেন, একটু অক্সিজেন! আমি ধড়ফড় করছিলাম একটু অক্সিজেনের জন্য। চোখে আস্তে-আস্তে অন্ধকার নেমে আসছে। মৃত্যুযন্ত্রণা কাকে বলে বুঝতে পারছি। বুঝতে পারছি ক্যামুফ্লেজিয়াআমার খুব কাছেই আছে। জ্ঞান হারাবার আগে শুনতে পেলাম আমার মোবাইল বাজছে। বাজছে আমার খুব প্রিয় রিংটোন কারেন কার্পেন্টারের গলা... 'জাস্ট লাইক মি, দে ওয়ান্ট টু বি... ক্লোজ টু ইউ।'

তারপরই সব অন্ধকার।

॥ ৬ ॥

মনে হচ্ছিল কোথাও একটা ভেসে বেড়াচ্ছি। না, এই জবরজং শরীরটা দিয়ে নয়, বরং বেশ সূক্ষ্ম একটা অস্তিত্ব টের পাচ্ছিলাম। এত হালকা নিজেকে কখনও মনে হয়নি। এত মুক্তও নয়। অনাবিল অন্ধকারের মধ্যে যেন সাঁতরে বেড়াচ্ছি। সাঁতরাতে-সাঁতরাতেই টের পেলাম, শরীরটা হঠাৎ করে বড্ড ভারী হয়ে যাচ্ছে। আঃ, অন্ধকারের মধ্যে কে আলো জ্বেলে দিল দুম করে? শান্ত, নিস্তব্ধতা ভেঙে নানারকম আওয়াজ কানে আসছে। দপ করে যেন চোখের সামনে লক্ষ হ্যালোজেন জ্বলে উঠল। মনে হচ্ছিল, আমি কোনও গহ্বর থেকে বেরিয়ে আসছি। চতুর্দিকে অনেক আওয়াজ, অনেক আলো আমায় কষ্ট দিচ্ছে। অনুভূতিগুলো যেন একটা অদ্ভুত পীড়নের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল। কোনও মতে চোখ মেলে তাকাই। কে আমাকে এমন ভাবে বিরক্ত করছে? কেনই বা করছে? দিব্যি তো ছিলাম একা-একা। কে? আলোর তীব্রতায় কিছুক্ষণের জন্য চোখ বুজে ফেলেছিলাম। আবার তাকানোর চেষ্টা করি। এত আলো, আমি কোথায়?

"অ নু প ম!"

কেউ আমার নাম ধরে ডাকছে। মুখের সামনে দু'টো ঝুঁকে পড়া উদ্বিগ্ন মুখ।

কে? চিনতে পারলাম না। সব ঝাপসা। শরীরটাকে ভীষণ ভারী মনে হচ্ছিল। কোনওমতে উত্তর দিই, "উঁ!"

"থ্যাঙ্ক গড! জ্ঞান ফিরেছে," কে যেন সোল্লাসে চেঁচিয়ে ওঠে, "ওঃ ঈশ্বর, হি ইজ ও কে। হি ইজ গেনিং সেন্স।"

ভীষণ ঘুম পাচ্ছিল। আস্তে-আস্তে ঘুমটা যেন আমায় চেপে ধরল। আবার অন্ধকার। কতক্ষণ মড়ার মতো ঘুমিয়েছি জানি না। অনেকক্ষণ একটানা ঘুমনোর পর আস্তে-আস্তে হুঁশ ফিরে পেলাম। এবার বুঝতে পারি নার্সিংহোমে আছি। এটা আই সি ইউ। আমার নাক থেকে বোধ হয় সদ্যই অক্সিজেন মাস্ক খোলা হয়েছে।

"অনুপম, কেমন লাগছে এখন?"

পরিচিত গলার স্বর শুনে ঘাড় ঘুরিয়ে পাশে তাকাই। যা দেখলাম, তাতেই চক্ষু চড়কগাছ। আমাকে রাখা হয়েছে ডঃ হিঙ্গোরানি ও ডঃ বসুর নার্সিংহোমেই। ইনফ্যাক্ট তাঁদের পাশেই।

বিস্ময়ের কথা এটা নয়। যা দেখে চমকে উঠলাম তা হল,

ওঁরা দু' জনই আমার বিছানার পাশে বসে উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন আমার দিকে। বিস্ময়ের পরই অদ্ভুত আনন্দে মন ভরে গেল। পারেনি, ক্যামুক্লেজিয়া এই দু' জনকে নিয়ে যেতে পারেনি। ক্যামুক্লেজিয়া হেরে গিয়েছে, হেরে গিয়েছে। সৃষ্টি তার স্রষ্টাকে ধ্বংস করতে পারেনি।

আমি প্রায় লাফ মেরে উঠে বসতে যাচ্ছিলাম, তার আগেই ডঃ হিঙ্গোরানি আমায় ধরে ফেলেছেন। সস্নেহে টেনে নিলেন বুকে, "ওয়েলকাম ব্যাক অনুপম। যা ভয় দেখিয়েছিলে! সাতদিন ধরে তোমার সেন্স ছিল না। এমন কাণ্ড একজন বিজ্ঞানী হয়ে করলে কী করে?"

আমি বলতে গেলাম, "ক্যামুক্লেজিয়া।"

আমাকে থামিয়ে দিয়ে ডঃ বসু বললেন, "ক্যামুক্লেজিয়া নয়, তোমার রোজ এসেন্সে অ্যালার্জি এবং তার সঙ্গে প্রচুর অ্যান্টি অ্যালার্জির ওষুধ। তুমি একজন বিজ্ঞানী। তোমার মনে ছিল না যে, যত নিরীহ অ্যালার্জির ওষুধই হোক না কেন, বেশি খেলে মারাত্মক ক্ষতিকারক হয়ে দাঁড়ায়। ক'টা খেয়েছিলে ট্যাবলেট?"

মনে করার চেষ্টা করি, "চার-পাঁচটা হবেই।"

ডঃ হিঙ্গোরানি শাসনের ভঙ্গিতে বললেন, "তোমার লজ্জা করে না? উপরে যাওয়ার বন্দোবস্ত তো প্রায় পাকাই করে ফেলেছিলে। তোমার কাজের লোক মদন ঠিক সময়ে উদ্ধার না করলে কোথায় থাকতে তুমি?"

এর পর তাঁদের মুখ থেকেই শুনি, মদন আমায় ওই অবস্থায় দেখে সঙ্গে-সঙ্গে ল্যান্ডফোন থেকে ফোন করে গৌতমকে। মদন মোটামুটি এসব কাজ করতে পারে, প্রতাপও পারে। গৌতমের কথা মতো ওরা দু'জনেই আমাকে ওই অবস্থায় এই নার্সিংহোমে নিয়ে আসে। এই সাতদিন রোজ দু' বেলা গৌতম এসেছে। মদন আমায় দেখতে না পেলেও আই সি ইউ-র সামনে থেকে এক মুহূর্তও নড়েনি। আজ আমার হুঁশ ফিরেছে শুনে মন্দিরে ছুটছে পুজো দিতে।

আবেগে চোখে জল এল। এরা সবাই আমাকে কত ভালবাসে! অথচ এই ক'দিন আমি শুধু স্বার্থপরের মতো নিজের কথাই ভেবে গিয়েছি। কী স্বার্থপর আমি! মনে একটা প্রশ্ন বারবার ফিরে আসছিল। থাকতে না পেরে প্রশ্নটা করেই ফেলি, "ডক্টর?"

"বলো।"

"গোলাপের গন্ধটা কোথা থেকে এল? আমার ঘরে কোথাও গোলাপ ছিল না। বাগান তো আমি নিজেই উড়িয়েছি। তবে?"

"তার উত্তরও মদন তোমার ডাক্তারকে দিয়েছে," ডঃ হিঙ্গোরানি হাসলেন, "তুমি ওকে রুম ফ্রেশনার আনতে দিয়েছিলে। ও জানত না যে, তোমার রোজ এসেন্সে মারাত্মক অ্যালার্জি। বেচারা একটা রোজ এসেন্সেরই রুম ফ্রেশনার এনেছিল।"

এবার ব্যাপারটা পরিষ্কার হল। ক্যামুক্লেজিয়া নয়, আসল ভিলেন ওই রুম ফ্রেশনার। আমি ঘরে ঢোকার আগেই সম্ভবত মদন স্প্রে করে রেখেছিল। ঘরে ঢোকামাত্রই ওই গন্ধটা পেয়েছি। গন্ধটা কাটাবার জন্য দরজা, জানলা বন্ধ করে দিয়ে বোকার মতো ওই রুম ফ্রেশনারটাই বারবার স্প্রে করেছিলাম। যার জন্য গোলাপের গন্ধ ক্রমশই বাড়ছিল। আর তার সঙ্গে বাড়ছিল আমার অ্যালার্জি।

ডঃ হিঙ্গোরানি বললেন, "আর একটু হলেই চ্যাপটার ক্লোজড হচ্ছিল তোমার। বেঁচে যে আছ এই অনেক।"

আমি আনন্দে গদগদ হয়ে বলি, "স্যার, আপনাকে দেখে যে কী আনন্দ হল। আমাদের যে কী অবস্থা হয়েছিল!"

"হ্যাঁ জানি," ডঃ বসু বললেন, "তুমি তো একেবারে হাউহাউ করে কাঁদছিলে।"

ওঁর কথা শুনে চমকে উঠলাম। উনি জানলেন কী করে? দু'জনেই তো কোমায় ছিলেন।

কথাটা বলতেই উত্তর এল, "ঘোড়ার ডিম ছিলাম। কিসস্যু হয়নি আমাদের। স্রেফ অসুস্থতার অ্যাকটিং করে ছুটি

কাটাচ্ছিলাম।"

আমি পুরো হাঁ, "তবে? ক্যামুফ্লেজিয়া? যা ভাবছিলাম তার সবটাই কী...?"

"ক্যামুফ্লেজিয়া?" হেসে ফেললেন ডঃ হিঙ্গোরানি। "ক্যামুফ্লেজিয়ার ফরমুলা শুনবে? বেশ, শোনো তা হলে...।"

এর পর ডক্টর যা বললেন, তাতে আমার আর একবার হার্টফেল করার মতো দশা হল।

ডক্টর হিঙ্গোরানি, ডঃ বসু ও ডঃ টোডি তিনজন মিলে গোপনে ক্যান্সার নিয়ে রিসার্চ করছিলেন। ক্যান্সারের ওষুধ বের করার চেষ্টা চলছিল। কাজ অনেকটাই গুটিয়ে এসেছে। অথচ এক্সপেরিমেন্ট এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য মূলধন অপর্যাপ্ত। সরকারি সাহায্য চাইলেন। প্রত্যাখ্যাত হল তাঁদের আবেদন। এদিকে কাজ এগিয়ে নেওয়ার জন্য টাকা চাই। কী করণীয়?

এই সময় ডক্টর টোডির মাথায় একটা অদ্ভুত বুদ্ধি এল। তিনি বললেন, সরকার জীবনদায়ী ওষুধের পিছনে টাকা খরচ করে না, কিন্তু মারণাস্ত্রের পিছনে করবে। তাই তিনজনে মিলে করলেন এই সাইলেন্ট কিলারের পরিকল্পনা। নতুন আবিষ্কারের উদ্দেশ্য নিয়ে নয়, সরকারের কাছ থেকে কিছু টাকা হাতানোর জন্য। যাতে তাঁদের গোপন আবিষ্কারের কাজ ঠিকঠাক চলতে পারে।

"তা হলে আমরা যে দেখলাম, ক্যামুফ্লেজিয়া শুঁকে গিনিপিগগুলো মরল?"

ডঃ বসুর সহাস্য উত্তর, "ওগুলো রোগেভোগে কষ্ট পাচ্ছিল, তাই ভাবলাম মার্সি ডেথ দিয়ে দিই। তিরিশ মিলিগ্রাম অ্যাকোনাইট আগেই ওদের শরীরে পুশ করা ছিল একদম সঠিক মাত্রায়, সঠিক টেম্পারেচারে। যাতে ঠিক এক ঘণ্টা পরেই মারা যায়। আর ঠিক এক ঘণ্টা পরেই তোমরা ডেমো দেখেছিলে।"

আমি হাঁ, কী বলব বুঝতে পারছিলাম না, "তবে রং পালটানোর ব্যাপারটা?"

"ওটাও প্রযুক্তিবিদ্যার কারিকুরি ডিয়ার," ডঃ হিঙ্গোরানি হাসছেন, "যে ডায়াসের উপরে আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম, তার ঠিক মাথার উপরই একটা ন্যানো প্রোজেক্টর ছিল। সেটা কন্ট্রোল করছিলেন ডঃ বসু। আমি সারফেসে যে রং রাখছিলাম, উনি ঠিক সেই রকম আলোই প্রোজেক্টরের মাধ্যমে ফুলটার উপর ফেলছিলেন। ওটার অরিজিনাল রং সাদা বলে, মনে হচ্ছিল রং পালটে-পালটে যাচ্ছে।"

"আর ডক্টর টোডি?"

ডঃ হিঙ্গোরানি দীর্ঘশ্বাস ফেলেন, "ওঁর মৃত্যুটা অরিজিনাল। বড্ড ড্রিঙ্ক করছিলেন আজকাল। ওটা আমাদের প্ল্যানের মধ্যে ছিল না। কথা ছিল, কাচের মধ্যে যে ফুলটা রাখা ছিল, সেটা একদম নষ্ট করে ফেলব এবং মাথা ফাটিয়ে ক্যামুফ্লেজিয়া চুরি যাওয়ার নাটক করব। আর সেটা করতে হবে কয়েকদিনের মধ্যেই। কারণ, ডিফেন্স এই ক্যামুফ্লেজিয়া নিয়ে যাবে। তার আগেই..."

"তা হলে ওটাও নাটক?"

"হ্যাঁ," ডঃ হিঙ্গোরানি বললেন, "ভেবেছিলাম যে, ডিফেন্স মিনিস্ট্রি হতাশ হয়ে এমন জিনিস দ্বিতীয়বার আর তৈরি করার কথা বলবে না। কিন্তু তারা আমাদের উপর চাপ দিতে লাগল আবার সেটা তৈরি করার জন্য। কী করে এড়ানো যায় তাই ভাবছিলাম। এর মধ্যেই ডঃ টোডি হার্টফেল করলেন। ওঁর হার্টের অবস্থা খারাপ ছিল। মৃত্যুটা খুব স্বাভাবিক। কিন্তু ওঁর মৃত্যুটাই আমাদের রাস্তা দেখিয়ে গেল। ঠিক তখনই দু'জনে মিলে ঠিক করলাম, এই রকম একটা নাটক করব, যাতে ডিফেন্স মিনিস্ট্রি হাড়ে-হাড়ে টের পায় এই জাতীয় অস্ত্র কী মারাত্মক হতে পারে।" তারপর হাসতে-হাসতে বললেন, "আশা করি এতদিন কোমায় থাকার পর ওরা আর আমাদের নতুন করে জিনিসটা আবিষ্কার করতে বলবেন না। যথেষ্টই ভয় পেয়েছেন।"

বিস্ময়ের প্রায় শেষ পর্যায়ে পৌঁছেছিলাম। ব্যাপারটা যত পরিষ্কার হচ্ছিল, ততই নিজের গালে চড় মারার ইচ্ছেটা প্রবল হয়ে উঠছিল। তা সত্ত্বেও আমার মনে একটা কিন্তু ছিল, "ডিফেন্স মিনিস্ট্রির টাকাটা কী হবে?"

"কী আর হবে?" ডক্টর সুন্দর হাসলেন, "ক্যামুফ্লেজিয়ার একটা মোটা টাকার ইনসিওরেন্স ওই কথা ভেবেই করিয়ে রাখা হয়েছে। সেই টাকা থেকে ওদের টাকা ফেরত যাবে। বাকি টাকাটা লাগবে আমাদের ক্যান্সার রিসার্চ প্রোজেক্টে।"

"ওই নামে কিছু কোনওদিন ছিল না, এখনও নেই, আগামীতেও হবে না," তিনি দুষ্টু বাচ্চার মতো হেসে উঠলেন, "তোমরা যা দেখছ, সেটা নেহাতই একটা ঘাসফুল। আর বাদবাকি সব মায়া। একথা আগে আমরা তিনজন আর পরে এই নার্সিংহোমের ডাক্তার জানতেন। তিনিও চমৎকার অ্যাকটিং করেছেন। আর এখন জানলে তুমি।"

আমি হতভম্ব হয়ে বসে রইলাম। তা হলে কিসের ভয় পেয়ে এসেছি! হঠাৎ করে প্রতাপের মুখটা মনে পড়ল। বড় কষ্ট হল ওর জন্য। বাড়িতে ফিরে ওকে বোঝানোর চেষ্টা করব নিশ্চয়ই।

কিন্তু ও কি বুঝবে?

ছবি: নির্মলেন্দু মণ্ডল